আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য পরিচয়ে তিন তরুনকে আটকের পর হত্যার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

গত ৩১ জুলাই ২০১১ সকাল আনুমানিক ৯টায় রাজধানীর দয়াগঞ্জ মোড় সংলগ্ন ৪৪ নং শরৎগুপ্ত রোডে বড় বাড়ির গেটের সামনে থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে রাজিব উল্লাহ সরদার (২৩), জুয়েল উল্লাহ সরদার (১৮) এবং মিজানুর হোসেন (১৮) নামের তিন তরুণকে একদল লোক ধরে নিয়ে যায়। পাঁচ দিন পরে গত ৫ অগাস্ট এই তিন তরুণের মৃতদেহ গাজীপুরের পুবাইল ও মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান থেকে হাত-পা বাঁধা ও গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়।

মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ঘটনাটির সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানের সময়ে অধিকার কথা বলে-

- নিহতদের মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী এবং
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ জুয়েল উল্লাহ সরদার ও মিজানুর হোসেন

উল্লেখ্য, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পরিচয়ে আটকের পর তিন তরুণের লাশ উদ্ধারের এ ঘটনার শিকার অপর তরুণ রাজিবের পরিবারের সঙ্গে তথ্যানুসন্ধানের জন্য তাঁদের বাড়িতে যাওয়া হয়। সেখানে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা এবং দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও পরিবারটির কোন সদস্যের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। রাজিবের চাচা এবং নিহত জুয়েলের বাবা সালাম সরদারকে অনুরোধ করে রাজিবের বড় ভাই রনিউল্লার সঙ্গেও যোগাযোগ করা যায়নি। সালাম সরদার জানান, রাজিবের মা ও বড় ভাই রনি এবং অন্যান্যরা সাক্ষাৎকার দিতে অনিহা প্রকাশ করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁরা কথা বলতে রাজি নন।

মমতাজ বেগম (৩৬), জুয়েলের মা

মমতাজ বেগম অধিকারকে জানান, ৩১ জুলাই ২০১১ আনুমানিক ৯ টায় দিকে তিনি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জানতে পারেন জুয়েলকে ডিবি পুলিশ ধরে নিয়ে মারপিট করছে এবং মেরে জুয়েলের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। ডিবি পুলিশ ধরে নিয়ে যাওয়ার পরে তিনি নিখোঁজ জুয়েলকে অনেক জায়গায় খুঁজেছেন। কাছে-দূরে সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে ২৫/৩০ হাজার টাকাও খরচ হয়েছে বলে তিনি জানান। তারপর পাঁচ দিন পর গাজীপুরে তাঁর ছেলেকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তিনি বলেন, শৈশবে মটরবাইক দুর্ঘটনায় জুয়েলের মাথায় প্রচণ্ড আঘাতের কারণে চিকিৎসকের পরামর্শে তাকে পড়ালেখায় চাপ না দেয়ায় সে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করে আর স্কুলে যেতে না চাওয়ায় তাঁকে এসি, ফ্রিজ মেরামতের কাজ শিখিয়ে বিদেশে পাঠানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, সাভারে এসি লাগানোর কাজে বাসা থেকে বের হয়ে জুয়েল যে আর ঘরে ফিরবে না তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। তিনি বলেন, তাঁর ছেলের কোন শত্রু নেই, এলাকায় সে সবার প্রিয় ছিল। তিনি বলেন, পুলিশ তাঁর ছেলেকে দুর্বৃত্ত সাজিয়ে নির্মমভাবে গলায়, হাতে-পায়ে, মুখের ভেতর গামছা ঢুকিয়ে মেরেছে। সে তো কোন দুর্বৃত্ত ছিল না। তিনি প্রধানমন্ত্রীসহ দেশবাসীর কাছে বিচার প্রার্থনা করে বলেন, তাঁর ছেলের মত আর কোন মায়ের সন্তানকে যেন এভাবে মর্মান্তিক মৃত্যুর শিকার হতে না হয়। তিনি এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত, বিচার ও শাস্তির দাবি জানান।

সালামউল্লাহ সরদার (৪২), জুয়েলের বাবা

সালাম উল্লাহ অধিকারকে বলেন, ৩১ জুলাই ২০১১ আনুমানিক ৯ টায় জুয়েলকে গেন্ডারিয়ার দয়াগঞ্জ পুরানো চৌরাস্তার মোড়ে পুলিশের লোক আটক করে মারধর করছে বলে জানায় তাঁর ছোট মেয়ে শম্পা (১৩)। তিনি এলাকার লোকজন নিয়ে দ্রুত সেখানে পৌঁছেও জুয়েলকে আর দেখতে পাননি। তিনি স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী লোকজনের মাধ্যমে জানতে পারেন ডিবি পুলিশের লোকজন জুয়েলকে মারধর করে হাতকড়া পড়িয়ে সাদা রঙের কালো কাঁচের মাইক্রোবাসে করে তুলে নিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের ভেতর কেউ কেউ জুয়েল এবং রাজিবকে চিনতে পেরে মারধর না করার জন্য অনুরোধ করতে এগিয়ে গেলে লোকগুলো বলেছে তারা ডিবির লোক, কেউ যেন ধারেকাছে না আসে। মারধরের কারণে জুয়েলের মাথা থেকে রক্ত ঝরছিল এবং সে নিজেকে নির্দোষ দাবি করে ডিবির লোকজনের কাছে তাকে না মারার জন্য আকুতি জানাচ্ছিল। তিনি জানতে পারেন স্থানীয় জাহাঙ্গীরনগর হাসপাতালে (দয়াগঞ্জ মোড়ের অদুরে অবস্থিত) জুয়েলকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে মাইক্রোবাসে তোলা হয়। তিনি বাসায় ফিরে এসে তাঁর স্ত্রী মমতাজ বেগমসহ আত্মীয়-স্বজনদের কাছে জুয়েলের নিখোঁজ হওয়ার খবর জানান। তিনি গেন্ডারিয়া থানা থেকে শুরু করে ডিবি কার্যালয়, সিআইডি কার্যালয়, র‍্যাব-১০, র‍্যাব-৩ ও র‍্যাব-১ এ খোঁজাখুঁজি করেন। সেখান থেকে বলা হয়েছে জুয়েল নামের কাউকে নিয়ে আসা হয়নি বা আটক করা হয়নি। গেন্ডারিয়া থানায় গেলে তাঁকে বলা হয় দুইটি মাইক্রোবাস ডিউটিতে বের

হয়েছে, ফিরে আসলে দেখা যাবে জুয়েলকে ধরা হয়েছে কিনা। তিনি বলেন, জুয়েল অপহরণের জিডি গেন্ডারিয়া থানা কর্তৃপক্ষ প্রথমে গ্রহণ করতে চায়নি। এছাড়া থানা থেকে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয় যে, জুয়েলের বিরুদ্ধে কোন মামলা না থাকলে তদন্ত শেষে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। তিনি বলেন, তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে কোনও থানায় মামলা তো দূরের কথা জিডি পর্যন্ত নেই।

গত ৭ অগাষ্ট গাজিপুর সদর হাসপাতাল থেকে জুয়েলের লাশ শনাক্ত করে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। জুয়েলের লাশ দাফন করার পর ১০ অগাষ্ট বিকেল আনুমানিক ৪ টায় গেন্ডারিয়া থানা থেকে এসআই কাওসার এসে রাজিবের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে। রাজিবের বড় ভাই রনিউল্লাহ তখন এসে তাঁকে জানায় যে, গেন্ডারিয়া থানা থেকে আসা এসআই কাওসার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়। তিনি তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসা একজন মানবাধিকার কর্মীর কথা রনিউল্লাহকে জানান এবং এবং এসআই কাওসারকে একটু অপেক্ষা করতে বলেন। রনিউল্লাহ তার বাসায় ফিরে গিয়ে এস আই কাওসারকে জুয়েলের বাবা সালামউল্লা সরদার এর বক্তব্য জানালে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে এস এই কাওসার তখনকার মত চলে যান। একই দিনে রাত ১০ টায় পুনরায় এস আই কাওসার তাদের বাড়িতে যেয়ে জানতে চায় যে, জুয়েল এবং রাজিবের মৃত্যুর ব্যাপারে তাদের পক্ষ থেকে কোন মামলা দায়ের করা হবে কিনা অথবা হয়েছে কিনা। জুয়েল এবং রাজিবকে অপহরণ এবং হত্যার পেছনে গেন্ডারিয়া থানার জড়িত থাকার বিষয়ে তিনি সন্দেহ করে বলেন, আইনশৃংঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের পরিচয়ে অপহরণের কারণে সাধারণ জিডি করতে গেলে সেদিন যারা জুয়েলের অপহরণ সংক্রান্ত সাধারণ ডায়রী গ্রহণে অপরাগতা প্রকাশ করেছিল এবং জিডি করার পরে বাড়িতে এসে কখনো জুয়েলের ব্যাপারে কোন খোঁজ নেয়নি তারা। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, গাজিপুর থেকে পুলিশ বাড়িতে এসেছে, এমনকি সিরাজদিখান থেকে তাঁদের বাড়িতে পুলিশ এসে বিস্তারিত জেনেছে, তাঁদের কাছ থেকে তথ্য নিয়েছে অথচ তাঁর বাড়ির কাছে গেন্ডারিয়া থানার কেউ এসে জুয়েল এবং রাজিবকে পাওয়া গেল কি না তা খোঁজ নেয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। তিনি বলেন, এতদিন পরে থানার লোকজনের এসব বিষয়ে জানার আগ্রহ কেন? তাও আবার লাশ দাফন করার ৫/৬ দিন পরে। পুলিশের লোক তাহলে এমনিভাবে মানুষকে মেরে ফেলবে? সাধারণ মানুষ তাহলে কোথায় আশ্রয় নেবে।

রানু (২০), জুয়েলের বড় বোন

রানু অধিকারকে জানান, ৩১ জুলাই ২০১১ আনুমানিক ৮ টায় জুয়েল তাঁকে ভাত মেখে খাইয়ে দিতে বলে। মায়ের অনুপস্থিতে জুয়েলকে তিনি ভাত মেখে খাইয়ে দিতেন বলে জানান। ভাত খাওয়ার পরে জুয়েল সাভারে এসি লাগানোর কাজে তার দোকানের মালিক জনির বাসার উদ্দেশে বের হয়ে যায়। স্থানীয় এসি/ফ্রিজ মেরামতকারী দোকানের মালিক জনির মা জুয়েলকে চিনি ও চা পাতা নিয়ে আসার জন্য দোকানে পাঠান। সিটি তেহারির কাছে রাজিবের সঙ্গে জুয়েলের দেখা হলে রাজিব তাকে কাছে ডাকে। জুয়েল তার কাছে গেলে

তাকেও ডিবির লোকজন আটক করে। সে কিছু বুঝে উঠতে না পেরে জিজ্ঞেস করে আমাকে কেন ধরেছেন, আমাকে ছাড়ুন, আমি সাভারে যাবো, আমার কাজ আছে। তাকে চর-থাপ্পর দেয়া শুরু করলে সে তর্কবিতর্ক করে। সে প্রতিবাদ জানিয়ে বলে আমি কোন দুর্বৃত্ত নই। আমাকে মারছেন কেন? ডিবির লোকজনের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক ও প্রতিবাদ করাই ওর জন্য কাল হয়েছে বলে তিনি জানান। স্থানীয় লোকজন মারধর করার দৃশ্য দেখে তারা এগিয়ে এসে তাকে না মারার জন্য বললে ডিবির লোকজন আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অস্ত্র দেখিয়ে হুমকি দিয়ে বলে আপনারা সরে যান, আমরা ডিবির লোক। জুয়েলকে বেধরক মারধর করে ঘটনাস্থলেই আধমরা করে ফেলে তারা। জুয়েলের মাথায় আঘাত পাওয়ার কারণে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল তখন প্রত্যক্ষ্যদর্শীরা তাঁকে জানায়, জুয়েল এবং রাজিবকে মারধর করতে দেখে আর্মির গাড়ি ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময়ে থামে, তখন আইনশৃংঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয়দানকারী ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে এসে নিজেদের আইডি কার্ড দেখালে গাড়িটি চলে যায়। তিনি তাঁর ভাই হত্যার বিচার দাবি করেন।

জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, জাহাঙ্গীর নগর হাসপাতাল এর রেজিস্টার

জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস অধিকারকে জানান, ৩১ জুলাই ২০১১ সকাল আনুমানিক ৯টা থেকে ৯:১৫ টায় কিছুসংখ্যক লোক স্বামীবাগের ৩৪/১ মনির হোসেন লেন, নিউ রোড, ঢাকা-১১০০ এ অবস্থিত জাহাঙ্গীরনগর হাসপাতালে একটি ছেলেকে নিয়ে এসে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়েছে। রোগীর মাথায় আঘাতজনিত রক্তাক্ত স্থানে ব্যান্ডেজ করা হয়। কর্তব্যরত ডাক্তারের নাম তিনি মনে করতে পারেননি।চিকিৎসাপত্র দেয়া হয়নি বা রোগীর নামও রেকর্ড করা হয়নি বলে তিনি জানান। লোকগুলো ছেলেটাকে নিয়ে তরিঘড়ি করে হাসপাতাল প্রাঙ্গন থেকে বের হয়ে চলে যায়। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তিনি জানান, তিনি অনুমান করতে পারেননি যে, ছেলেটি কোথাকার বা কি ঘটনায় সে আহত হয়েছে। প্রতিদিন এ ধরণের অনেক রোগীই তাঁদের কাছে চিকিৎসার জন্য আসে বলে তিনি জানান।

মোঃ হানিফ (৫৫), প্রত্যক্ষদর্শী

মোঃ হানিফ ওরফে হনু অধিকারকে জানান, ৩১ জুলাই ২০১১ আনুমানিক সকাল সাড়ে ৮ টা থেকে ৯ টার মধ্যে শরৎগুপ্ত রোডে তিনি চাল-ডাল-মসলা ভাঙ্গানোর দোকানে বসেছিলেন। কিছু লোককে ৪৪ নং বাড়ির পাশেই নির্মাণাধীন বাড়ির মধ্য থেকে একটি ছেলেকে ধরে নিয়ে আসতে দেখেন। সাদা পোশাকধারী অজ্ঞাত লোকগুলো সংখ্যায় ৭/৮ জন হবে বলে তিনি জানান। ছেলেগুলো যে তাঁরই এলাকার তা তিনি প্রথমে বুঝতে পারেননি। তাঁর দোকানের বিপরীতে নারিন্দার ৪৪নং শরৎগুপ্ত রোডে বড় বাড়ি নামে পরিচিত বাড়ির গেটের সামনে ভীড় দেখতে পান। এরপরই তিনি লোকগুলোকে দুটি ছেলেকে ধরে বেধরক মারতে দেখেন। লোকজন ভীড় করলে সবাইকে সরে যেতে বলা হয়। তিনি দেখতে পান ধৃত ছেলেদের মধ্যে একটি ছেলে মারধর করার কারণে প্রতিবাদ করছে এবং সে তর্ক-বিতর্ক করার কারণে একজনের হাতে থাকা পিস্তল দিয়ে সজোরে তার মাথায় আঘাত করা হয়। ছেলেটির মাথা

থেকে তখন রক্ত পড়তে থাকে। ছেলেটি তাদের হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্য কাকুতি-মিনতি করে। একই সঙ্গে তিনি সিটি তেহারীর দোকানের সামনে কয়েকজন লোককে একটি ছেলের কোমরে ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে থেকে কেউ কেউ ছেলেগুলোকে চিনতেও পারে এবং মহল্লার লোকজন এগিয়ে গিয়ে ছেলেগুলোকে ভালো বললেও যারা তাদের ধরেছিল তারা তাতে কর্ণপাত করেনি। নিজেদের ডিবি পুলিশ পরিচয় দিয়ে তাদেরকে আরও মারতে থাকে। রাস্তায় চলাচলকারী স্থানীয় অনেকেই এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। ধৃত তরুনদের মারতে মারতে শরৎগুপ্ত রোড ছেড়ে দয়াগঞ্জের মোড়ে তাদেরকে নিয়ে যেতে দেখেন তিনি। তারপর আহত ছেলেটিসহ অন্যদেরকে জাহাঙ্গীরনগর হাসপাতালের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় বলে তিনি জানান।

রিনা বেগম (৪০), নিহত মিজানুর হোসেনের মা

রিনা বেগম অধিকারকে বলেন, ৩১ জুলাই ২০১১ সকাল ৭ : ১৫ টায় তিনি কাঁচপুর ফ্যাশন গার্মেন্টসে কাজের উদ্দেশে বের হয়ে যান। ৩৬/৩ দক্ষিণ যাত্রাবাড়ির বর্তমান বাসায় আসার আগে তাঁরা দীর্ঘদিন করাতিটোলায় ছিলেন। তাঁর দুই ছেলে সেখানেই বড় হয়েছে। বিগত ৪/৫ বছর আগে একটি উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যা হত্যা মামলায় তাঁর ছেলে মিজানুরকে জড়ানো হয়। সেই মিথ্যা মামলা থেকে মিজানুর অব্যাহতি পায় বলেও তিনি জানান। তাঁর দুই ছেলে মনির এবং মিজানুরকে কেউ এলাকায় খারাপ বলতো না। ছেলেরা ওয়ার্কশপে কাজ করতো। তিনি তাঁর ছেলেকে নিরপরাধ উল্লেখ করে বলেন, মিজানুর যদি কোন মামলার আসামি হতো তাহলে ডিবির লোকজন আটক করে কেন তাকে থানায় হস্তান্তর করলো না। তিনি তাঁর সন্তান হত্যার জন্য দায়ীদের বিচার ও শাস্তির দাবি করেন।

মনির হোসেন (২১), নিহত মিজানুর হোসেনের বড় ভাই

মনির হোসেন অধিকারকে জানান, ৩১ জুলাই ২০১১ আনুমানিক সকাল ৮ টা থেকে ৮ : ৩০ টায় মিজানুর ঘুম থেকে উঠে রাজিবের ফোন রিসিভ করে। এই সকালে কে ফোন করেছে মনির হোসেন জানতে চাইলে মিজানুর তাঁকে জানায় যে, দয়াগঞ্জের সরদারপট্টির রাজিব ফোন দিয়েছে। তিনি তখন মিজানুরের হাত থেকে মোবাইলটি নিয়ে রাজিবকে জিজ্ঞেস করেন কেন সে ফোন করেছে? রাজিব প্রত্যুত্তরে জানায় যে, মিজানুরের সঙ্গে তার কথা বলা প্রয়োজন। তিনি মিজানুরকে তাঁর মোবাইল ফোনটি বন্ধ করে রাখার জন্য বললেও সে মোবাইলটি চালু রাখে। কিছুক্ষণ পর আবারও মিজানুরের কাছে রাজিবের ফোন আসে। রাজিবের ফোন পেয়ে মিজানুর ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে কথা বলে। কথা বলার পরপরই সে ঘরে ঢুকে প্যান্ট-শার্ট পরে বাইরে যাবার প্রস্তুতি নেয় এবং তাঁকে জানায় যে, সে যাবে আর আসবে এই বলে মিজানুর বাসা থেকে বেড়িয়ে পরে। যাত্রাবাড়িতে মিজানুরের সঙ্গে রাজিবকে মাঝে মাঝে তিনি দেখতে পেতেন কিন্তু কথা তেমন হতো না। রাজিবের চাচাত ভাই জুয়েলকে তিনি আগে চিনতেন না। তিনি তাঁর ছোট ভাই মিজানুরের কাছে কোন একদিন জিজ্ঞেস করে

বুঝতে চেয়েছেন যে, রাজিবের সঙ্গে মিজানুরের কি ধরণের সম্পর্ক। মিজানুর তাঁর প্রশ্ন এড়িয়ে গেছে তখন। রাজিব যাত্রাবাড়িতে প্রায়ই আসা যাওয়া করতো বলে তিনি জানান।

বিকাল ৫ টায় তাঁর এক বন্ধু তাঁকে খবর দেয় যে, মিজানুরকে ডিবি পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। জাহাঙ্গীরনগর হাসপাতালে মিজানুর রয়েছে। তখন তিনি এ খবরটি বিশ্বাস করেননি এবং তাৎক্ষণিকভাবে মিজানুরের মোবাইলে ফোন দিলে সেটি বন্ধ পান। তারপর দ্রুত বাসায় ফিরে এসে দেখেন মিজানুর সেখানে নেই। আরও খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারেন যে, ডিবি পুলিশ তাকে আটক করে নিয়ে গেছে। তিনি নিজে নিশ্চিত হয়ে মিজানুরের গ্রেফতারের ঘটনা তাঁর বাবাকে জানান। তারপর তিনি সুত্রাপুর থানায় গেলে সেখান থেকে তাঁকে গেন্ডারিয়া থানায় পাঠানো হয়। গেন্ডারিয়া থানা থেকে তাঁকে জানানো হয় মিজানুর নামের কোন আসামীকে থানায় নিয়ে আসা হয়নি। গেন্ডারিয়া থানা থেকে যাত্রাবাড়ি থানায় গেলে কর্তব্যরত পুলিশ থানা হাজতের অভ্যন্তরে নিয়ে অন্যান্য গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে মিজানুরকে খুঁজে দেখতে বলেন। কিন্তু সেখানে মিজানুরকে না পেয়ে তিনি চলে আসেন। তারপর থেকে মিজানুরকে বিভিন্ন জায়গায় খুঁজেছেন। সম্ভাব্য জায়গাগুলোয় খুঁজে না পেয়ে অবশেষে ৪ অগাস্ট গেন্ডারিয়া থানায় সাধারণ ডায়রি করতে গেলে কর্তব্যরত পুলিশ জিডি গ্রহণে অনিহা প্রকাশ করে। সেখান থেকে তাঁদেরকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কোর্ট-কাচারীর গারদঘর এবং হাসপাতালগুলোর মর্গে সন্ধান করতে বলা হয়। ন্যাশনাল হাসপাতাল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ কেন্দ্রীয় কারাগারে খোঁজ করেও তাকে না পাওয়ায় আবারও গেন্ডারিয়া থানায় এসে ধর্না দিলে জিডি নেয়া হয়। তিনি অপহরণের জিডি করতে চাইলেও মিজানুরকে নিখোঁজ দেখিয়ে জিডি করা হয় বলে তিনি অভিযোগ করেন। জিডির কপি নিয়ে সিআইডি কার্যালয়, ডিবি কার্যালয়সহ র‍্যাব-১০ ও র‍্যাব-৩ এ খুঁজেও তাকে পাওয়া যায়নি।

তিনি আরো জানান, ৫ অগাস্ট রাতে তাঁর বন্ধুর এক ভাই তাকে ফোনে জানায় যে, গাজিপুর সদর হাসপাতালে দুইটি লাশ পাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। রাত ২টা পর্যন্ত তিনি টিভি খুলে বিভিন্ন চ্যানেলে দৃষ্টি রেখেছেন, ব্রেকিং নিউজগুলোও দেখেছেন কিন্তু কোথাও মিজানুরের লাশ পাবার খবর দেখতে পাননি । ৬ অগাস্ট সকালে মিজানুরের বন্ধু রতন (১৮) তাঁকে ঘুম থেকে তুলে যায়যায়দিন পত্রিকা হাতে দিয়ে মিজানুরের মৃত্যু সংবাদটি দেখায়। তিনি পত্রিকায় মিজানুর, জুয়েল এবং রাজিব এর মৃত্যুর বর্ণনা ও লাশের ছবি দেখেন কিন্তু পত্রিকাটিতে চেহারার অংশ অস্পষ্ট থাকায় তিনি নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। পত্রিকায় ঘটনার বর্ণনা অনুযায়ী চেক শার্ট ও কালো প্যান্ট এবং লাশের দৃশ্যে কিছুটা মিল খুঁজে পেয়ে ৭ অগাস্ট গাজীপুর সদর হাসপাতালে পৌঁছান। হাসপাতালের লাশঘরে গিয়ে মিজানুরের বিকৃত শরীর দেখে প্রথমে তাকে শনাক্ত করতে পারেননি। পরে তিনি ডোমের কাছে ওই লাশের শার্ট-প্যান্ট দেখতে চান এবং মিজানুরের শার্ট-প্যান্ট দেখে তারপর তাকে শনাক্ত করেন। তিনি বলেন, মিজানুরের পকেটে ১৯,০০০/০০ (উনিশ হাজার) হাজার টাকা ছিল, কয়েকদিন আগের কেনা নতুন একটা মোবাইল সেট ছিল, কিন্তু সেগুলো আর পাওয়া যায়নি। গাজীপুর থানায় লাশ

নিয়ে আসার জন্য অনেক দরকাষাকষির পরে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার বিনিময়ে কর্তৃপক্ষ তাঁদের কাছে লাশ হস্তান্তর করে। মিজানুরকে জুরাইন কবরস্থানে দাফন করা হয়।

ফারুক আহমেদ, বি পি এম, অফিসার ইনচার্জ, গেন্ডারিয়া থানা

ফারুক আহমেদ অধিকারকে জানান, জুয়েল এবং রাজিবের পরিবার গেন্ডারিয়া থানায় গত ০১ অগাস্ট ২০১১ তারিখে সাধারণ ডায়রি জি.ডি. নং- ২৩ ও ২৪ করে। প্রশাসন কর্তৃক করণীয় হিসেবে সারা বাংলাদেশের থানাসমুহে নিখোঁজ সংক্রান্ত তথ্য দেয়া হয় এবং তাঁদের খোঁজ নেয়ার জন্য সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা চালানো হয় বলে তিনি জানান।

কে এম আবুল কাসেম, অফিসার ইনচার্জ, যাত্রাবাড়ী থানা

কে এম আবুল কাসেম অধিকারকে জানান, গত ৫ অগাস্ট ২০১১ তাঁরা থানায় জিডি গ্রহণ করেছেন। ০৫.০৮.১১ তারিখে জি.ডি. নং- ২৮৭। এ বিষয়ে তারা যথাসম্ভব তৎপর ছিলেন। মিজানুরের পরিবারের পক্ষ থেকে কোন মামলা করা হয়নি বলে জানান।

মাসুদুর রহমান, এডিসি, ডিবি, মিডিয়া এন্ড কমিউনিটি সার্ভিস, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ

মাসুদুর রহমান অধিকারকে জানান, ৩১ জুলাই ২০১১ সকালে তাঁদের কোন টিম দয়াগঞ্জ এলাকায় যায়নি। এ ব্যাপারে তাদের কোন কিছু করণীয় নেই। তবে তিনি বিষয়টি শুনেছেন এবং ঘটনার শিকার লোকজনের আত্মীয়রা তাঁর অফিসে এসে নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে জানিয়েছেন বলে তিনি জানান।

অধিকার এর পর্যবেক্ষণ

অধিকার এর তথ্যানুসন্ধানকালে নিহতদের মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য নেয়া হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্যের সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বক্তব্যে অমিল পাওয়া গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্যে পাওয়া যায় ডিবি পুলিশ অস্ত্র নিয়ে এলাকাবাসীর উপস্থিতিতেই তাঁদের মারধর করে মাইক্রোবাসে করে ধরে নিয়ে যায়।

তরুণদের লাশ সনাক্তের পর পরিবারের অভিযোগ, নিহতরা নিরাপরাধ এবং ডিবি পুলিশ তাদের আটক করার পরে বেআইনীভাবে গুলি করে হত্যা করে। নিহতের পরিবার আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে গেলেও ডিবি পুলিশ কর্তৃক আটক ও হত্যার বিষয়ে কোন সদুত্তর পায়নি এমনকি পরিবারগুলোর পক্ষ থেকে মামলা বা জিডি গ্রহণেও গড়িমসি করা হয় বলে জানা যায়। গেন্ডারিয়ার দয়াগঞ্জ থেকে ধরে নেয়ার পাঁচ দিন পর নিখোঁজ তিন তরুণের লাশ গাজীপুর ও মুন্সিগঞ্জে পাওয়া যায়। তরুণদের উদ্ধার কিংবা তাদের সন্ধানের বিষয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে কোন সহযোগিতা বা তৎপরতাও ছিল না বলে পরিবারগুলো জানা যায়।

অধিকার ডিবি পুলিশ কর্তৃক তিন তরুণকে ধরে নিয়ে যাওয়া এবং নিখোঁজ হওয়ার পাঁচ দিন পর লাশ পাওয়ার বিষয়টি নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-